রাজাকার আর মিথ্যাচার পরাজিত

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ. কে. মোহাম্মদ আলী শিকদার, পিএসসি (অব.)

কথায় বলে 'দশ দিন চোরের একদিন গৃহস্থের।' সেই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে প্রতিদিন, প্রতিমাস প্রতিটি বছর ছিল লাখো বাঙালীর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ হারানোর দিন। শত প্রতিরোধ বুহ্য সৃষ্টি করেও বাঙালী পরিপূর্ণভাবে কখনও রুখতে পারেনি লুণ্ঠনকারীদের। দীর্ঘ ৩৩ বছর পরে ২৯ ডিসেম্বর ছিল বাংলাদেশের বাঙালীর জন্য গৃহস্থের দিন। এ দিন বাংলাদেশ নামক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মালিক তার জনগণ ব্যালটযুদ্ধের মাধ্যমে চিহ্নিত মিথ্যাবাদী ও রাজাকারদের সম্মিলিত চক্রকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। শুধু প্রত্যাখ্যানই করেনি, এতদিন যাবত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি মিথ্যাচার, অবিচার, নির্যাতন ও অত্যাচার করে জাতির যে অপূরণীয় ক্ষতি করেছে তার যথাযথ বিচারের ম্যান্ডেট দিয়েছে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে। যেমনটি ম্যান্ডেট দিয়েছিল এদেশের মানুষ ১৯৭০ সালে বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানী শাসকদের অত্যাচার ও নির্যাতন থেকে বাংলার মানুষকে মুক্ত করার জন্য। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পরেও বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব বিজয়কে সারাবিশ্ব থেকে অভিনন্দন জানিয়ে নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ এবং জনগণের প্রকৃত ইচ্ছার প্রতিফলন বলে আখ্যায়িত করেছিল। অল্প কিছুদিন আগে বিএনপি-জামায়াত জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাঁর স্বভাবসুলভ অসত্য বক্তব্যের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রধান অনুঘটক ওই সত্তরের নির্বাচনের মুখে কালিমা লেপনের যে অপচেষ্টা করেছিলেন বাংলার জনগণ ২৯ ডিসেম্বর বেগম জিয়ার দলকে প্রত্যাখ্যান করে তার সমুচিত জবাব দিয়েছে। সত্তরের নির্বাচনের মতো ২০০৮ সালের নির্বাচনকেও বিশ্বসংস্থাসমূহ এবং বিশ্বের সকল প্রান্ত থেকে আগত পর্যবেক্ষকগণ নজিরবিহীন স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ বলে উল্লেখ করেছেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত ও এনডিআই পর্যবেক্ষক দলের প্রধান হাওয়ার্ড শেফার্ড বলেছেন, "২৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশে একটি আন্তর্জাতিক মানের নির্বাচন হয়েছে। তাঁদের পর্যবেক্ষক দল সারাদেশে ঘুরে কোথাও কোন অনিয়ম দেখতে পায়নি। গণমানুষের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো"। ইউরোপীয় ইউনিয়ন পর্যবেক্ষক দলের প্রধান সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তাঁদের প্রাথমিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন, "নির্বাচনে জনগণের প্রকৃত ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে। ভোট কারচুপির অভিযোগ মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়"। উপরোক্ত দু'টি প্রতিবেদনের মতো একই ধরনের মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক পর্যবেক্ষক দল আইআরআই, কমনওয়েলথ, জাতিসংঘ এবং জাপানী পর্যবেক্ষক দলের প্রধানগণ। সারাপৃথিবীর নজর ছিল এই নির্বাচনের ওপর। সিএনএন ও আল জাজিরার মতো বিশ্বখ্যাত টিভি চ্যানেলও তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ করেছে ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনী ফলাফল। কিন্তু বিএনপি-জামায়াত জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এই নির্বাচনকে মহাকারচুপির নির্বাচন হিসেবে উল্লেখ করে তাঁর প্রচলিত স্বভাব ও আচরণের বহির্প্রকাশ ঘটিয়েছেন। আমার বিশ্বাস হিটলারের প্রচার বিভাগের প্রধান গোয়েবলস্ যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে জামায়াত-বিএনপির বিগত ৩৩ বছরের সুপরিকল্পিত মিথ্যাচারকে বাংলার জনগণ, বিশেষ করে নতুন প্রজন্ম যেভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে তা দেখে নিজেকে সংশোধন করতেন এবং একই মিথ্যা কথা বার বার বললে সত্যে পরিণত হয়– এই ভ্রান্ত তত্ত্ব নিজেই প্রত্যাখ্যান করতেন। কিন্তু বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা বিএনপি নামক দলটি দাঁড়িয়ে আছে সম্পূর্ণ অসত্যের ওপর। দলটির না আছে কোন আদর্শ, না আছে কোন নীতি ও দর্শন। নেই নৈতিক বলে বলীয়ান কোন নেতৃত্ব। যে দলের প্রধান দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে বসে কর ফাঁকি দেন ও জরুরী আইনের পাল্লায় পড়ে জরিমানা দেন, সে নেত্রীর কথা দেশের মানুষ যে আর বিশ্বাস করবে না সেটা সারাবিশ্বের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে ২৯ ডিসেম্বরে চারদলীয় জোটের ভূমিধস পরাজয়ের মাধ্যমে। যে নেত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী নিজের জন্ম তারিখ নিয়ে জাতিকে বিভ্রান্তিতে ফেলেন, দেশের মহান নেতার মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড নিয়ে পরিহাস করেন, যাঁর পুত্রগণের নামে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিদেশী রাষ্ট্র ও একাধিক আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতনামা মিডিয়ায় দেশের টাকা লুটতরাজের খবর ছাপা হয়, দেশের মানুষ সেই দলকে যে আর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় দেখতে চায় না সেটাই জনগণ জানিয়ে দিয়েছে ২৯ ডিসেম্বর তাদের ব্যালটের মাধ্যমে। নিবন্ধের কলেবর সংক্ষিপ্ত করার স্বার্থে বিএনপির সহযোগী জামায়াতের মিথ্যাচারের কাহিনী যত কম বলা যায় ততই মঙ্গল। এই জামায়াত ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর দোসর হয়ে রাজাকার-আলবদর হিসেবে বাংলাদেশের মানুষকে নির্বিচারে হত্যা ও ধর্ষণ করেছে এবং করেছে অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ। জিয়া, এরশাদ এবং এ দু'জনের ধারাবাহিকতায় বেগম খালেদা জিয়া এহেন ঘৃণ্য ব্যক্তিদের পাপকাজকে বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের কাছ থেকে আড়াল করার জন্য এমন কোন জঘন্য কাজ নেই যা তারা করেনি। মুক্তিযুদ্ধের বিকৃত ইতিহাস বাধ্যতামূলক– পাঠ্যপুস্তকে লিখে এ দেশের লাখো-কোটি কোমলমতি শিশুকে করেছে বিভ্রান্ত। কিন্তু কথায় বলে, 'পাপে ছাড়ে না বাপেরে'। তাই ২০০৮ সালের নির্বাচনে নতুন প্রজন্ম সমস্ত বিভ্রান্তি ও অপপ্রচার এবং মিথ্যাচারের বেড়াজাল ভেঙ্গে বেরিয়ে এসে যুদ্ধাপরাধী জামায়াত ও তাদের প্রশ্রয়দানকারী, লালন-পালনকারী বিএনপিকে ভোটযুদ্ধের মাধ্যমে ধরাশায়ী করেছে। পরাজিত করেছে রাজাকার-আলবদর শিরোমনি নিজামী, মুজাহিদ ও সাঈদীদের। ধরাশায়ী করেছে জামায়াতের সহযোগী বিএনপির তথাকথিত হেভিওয়েট নেতাদের। মোট কথা গণজাগরনের মুখে পরাজিত হয়েছে ৩৩ বছরের মিথ্যাচার এবং এই মিথ্যাচারের প্রধান বাহক জামায়াত-বিএনপি। তাই খালেদা জিয়া ও তাঁর দল যতই গলা ফাটাক না কেন, তা শোনার লোক দেশে-বিদেশে কোথাও তাঁরা খুঁজে পাবে না। তাঁদের বোঝা উচিত এ দেশের নতুন প্রজন্ম সচেতনভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। তারা নতুন কিছু শুনতে চায় এবং পেতে চায়। দেশ গেল, ইসলাম গেল, ধর্ম গেল, এসব বস্তাপচা ভণ্ডামী তারা আর শুনতেও চায় না, দেখতেও চায় না। অকাতরে ও স্বপ্রণোদিত হয়ে যে দেশের ৩০ লাখ আবালবৃদ্ধবনিতা স্বাধীনতার জন্য জীবন দিতে পারে সে জাতির স্বাধীনতার ওপর এত সহজে কেউ হাত দিতে পারবে না, এটা এখন গ্রামের সহজ সরল মানুষের কাছেও দিবালোকের মতো পরিষ্কার। নতুন প্রজন্ম তাদের বিস্ময়কর রায়ের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছে, তাঁরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চায়, তাঁরা ধর্মান্ধতার অবসান চায়, তাঁরা তাদের বাঙালীত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়।

এবারের নির্বাচনে নারী ভোটাররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। জানিয়ে দিয়েছেন তারা ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের প্রণীত নারী নীতির বাস্তবায়ন চায়। নারীকুলকে যারা কালো কাপড়ে মুড়িয়ে রাখতে চায়, তাদেরকে তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছে। সার্বিকভাবে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের আমল, ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত জামায়াত-বিএনপির আমল এবং ২০০৬ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত অনির্বাচিত সরকারের শাসনামলের তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ এবারের নির্বাচনে বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছে। সর্বোপরি নির্বাচনের প্রাক্কালে দেশী-বিদেশী সকল সচেতন সমাজ দুই প্রধান নেত্রীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও

দূরদর্শিতার চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছে। ১/১১-এর পরে উভয় নেত্রীই জেল খেটেছেন, নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, তবে তুলনামূলকভাবে শেখ হাসিনার প্রতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতিহিংসা বা আক্রমণ ছিল বেশি। তারপরও জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে শেখ হাসিনা হয়ে ওঠেন ইতিবাচক রাজনীতির মূর্ত প্রতীক। তিনি নির্বাচনী প্রচারে রাজনীতির স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁর নেতৃত্বে ১৯৯৬-২০০১ সালের সরকারের সঙ্গে বেগম জিয়ার ২০০১-২০০৬ সালের সরকারের তুলনামূলক চিত্র জনগণের কাছে তুলে ধরেন। সেই সঙ্গে আগামীতে ক্ষমতায় আসলে কী সময়ের ভেতর কী কাজ করবেন তা সুনির্দিষ্টভাবে জনগণের কাছে পেশ করেন। ২০২১ সালের জন্য একটি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ভিশন নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরে তাদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন। অন্য দিকে বেগম খালেদা জিয়া শুধু তাঁর দুই ছেলের দুর্দশার কথা তুলে ধরে জনগণের সহানুভূতি আদায়ের ব্যর্থ চেষ্টা করেন। দেশ ও দশের কথা বলার ফুরসত তিনি পাননি। দেশের মানুষ নিশ্চয় খেয়াল করেছে, দেশের কল্যাণ কোন্ পথে হবে, উন্নতি হবে কোন্ পথে, দেশের মানুষের জন্য কী ভাল কাজ করবেন এমন কোন কথা বেগম জিয়া তাঁর নির্বাচনী প্রচারে বলতে পারেননি। বেগম জিয়া কেবল একই কথা বলেছেন সবখানে, তিনি না জিততে পারলে দেশে ইসলাম থাকবে না, এই ধর্ম ব্যবসা ছাড়া তাঁর হাতে কোন ইতিবাচক রাজনৈতিক বক্তব্য ছিল না। তাই ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখের নির্বাচনের রায়ের মাধ্যমে দেশের প্রায় ১৫ কোটি মানুষ নীরবে জানিয়ে দিয়েছে ৩০ লাখ মানুষের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন মাতৃভূমির মাটি মানবের তরে, দানবের তরে নয়। এ দেশে মিথ্যাচার ও রাজাকারদের কোন স্থান নেই। সুতরাং তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছে মানবরূপী হায়েনা, যুদ্ধাপরাধী রাজাকার-আলবদরদের এবং এদের পুনর্বাসনকারীদের। এ দেশের নতুন প্রজন্ম দেখিয়ে দিয়েছে, নিজামী, মুজাহিদ, সাঈদী ও গোলাম আযম এখন আর কোন নাম নয়। 'মীর জাফর' নামটির মতো ওই নামগুলো এ দেশের মানুষের মুখে মুখে এখন গালিতে পরিণত হবে। হয়ত সেদিন আর বেশি দূরে নয়, যেদিন কাউকে নিজামী বললে সে তাড়িয়ে আসবে মারবার জন্য, যেমনটি করা হয় কাউকে মীর জাফর বললে। সুতরাং বলা যায় ২৯ তারিখের বিজয় হয়েছে দৈত্যের কবল থেকে মানবতার মুক্তির বিজয়। দুঃশাসন থেকে সুশাসনে উত্তরণের বিজয়। দখলদারের কাছ থেকে দেশকে উদ্ধারের বিজয়। রাজাকার-আলবদরের বাড়ি-গাড়ি থেকে রক্তেভেজা জাতীয় পতাকা নামানোর বিজয়। স্বাধীনতাবিরোধীদের হাত থেকে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করার বিজয়। লুটেরা অর্থনীতি থেকে রাষ্ট্রকে বাঁচানোর বিজয়। সর্বোপরি এ বিজয় গণজাগরণের বিজয়। জয় বাংলার বিজয়।

নয়নভরা জল আমার আঁজলাভরা ফুল

কাইউম পারভেজ, সিডনি থেকে

জানুয়ারি ২০০৯। এ জানুয়ারিতেই পূর্ব-পশ্চিমে বিশ্বের দুই গুরুত্বপূর্ণ দেশের দুই নেতা দুই দেশ পরিচালনার কঠিন দায়িত্ব গ্রহণ করতে চলেছেন। দু'জনার অবস্থানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাযুজ্য। তবে একজন পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী উন্নত দেশের নির্বাচিত নেতা অপরজন উন্নয়নশীল– তুলনামূলকভাবে দরিদ্র দেশের নেত্রী। একজনের দেশের অঢেল সম্পদ আর অন্য জনের সম্পদ সীমিত। দু'জনেই বিশাল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি তবু পরিবর্তনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ পরিবর্তনের জন্যই দু'দেশের মানুষ তাঁদেরকে দিয়েছে নির্বাচনী মহাবিজয়। ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরি। সত্যি বলতে এই দু'জন মানুষের কাছেই দু'দেশের মানুষ মুক্তি চেয়েছে। শোষণ, সন্ত্রাস, অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তাহীনতা, মানুষ হিসেবে বাঁচার স্বপ্নহীনতা থেকে মুক্তি পেতে ওষ্ঠাগত প্রাণ নিয়েই তাঁদের হাতে দায়িত্ব তুলে দিয়েছে। তাঁরা দু'জনেই বলেছেন আমরা পরিবর্তন আনব।

এঁদেরই একজন জননেত্রী শেখ হাসিনা পূর্বের দেশটির সদ্য নির্বাচিত নেত্রী প্রধানমন্ত্রী ইলেক্ট। বাংলাদেশের জনগণের নেত্রী। পশ্চিমের দেশ আমেরিকার নেতা ওবামা যেমন নিজের দলের এবং বিপরীত দলের ভোটারদের ভোট টেনেছেন তেমনি বাংলাদেশের এই জননেত্রী টেনেছেন প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সমর্থকদের বিপুল ভোট। নিজের দলের কর্মকাণ্ডে বীতশ্রদ্ধ হতাশ আস্থাহীন হয়ে এবার তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে জননেত্রীকে ভোট দিয়ে মুক্তি চেয়েছেন। একাত্তরের পর এমন প্রাণঢালা গণসমর্থন, এমন গণজোয়ার মানুষ আগে কখনও দেখেনি। বাংলাদেশের মানুষের এমন বিজয় গত সাঁইত্রিশ বছরে আর হয়নি।

বলছিলাম গুরুত্বপূর্ণ দুই দেশের কথা। জানুয়ারি– এই ২০০৯-এর জানুয়ারি থেকেই আমেরিকার ওপর নির্ভর করছে সারা পৃথিবীর শান্তি, নিরাপত্তা এবং অগ্রগতি। তেমনি বাংলাদেশের এই জননেত্রীর ওপর নির্ভর করছে গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শান্তি নিরাপত্তা অগ্রগতি। যেহেতু এই দেশটির প্রায় চতুর্পার্শ্বেই প্রতিবেশী দেশগুলোর সীমান্ত কেবল কাঁটাতারের ব্যবধানে তাই বাংলাদেশের নীতি আইন ডিপ্লোমেসির ওপর নির্ভর করছে যেমন দেশের অর্থনীতি, বাণিজ্যিক প্রসার এবং সন্ত্রাসের হাত থেকে নিরাপত্তা– তেমন নির্ভর করছে গোটা অঞ্চলের সার্বিক স্থিতিশীলতা। বিগত আমলে লুটতরাজ আর দুর্নীতির আশ্রয়ে ক্ষমতা ধরে রাখার বাহুবল প্রচেষ্টায় যেমন জঙ্গী উত্থানের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে জোট সরকার নিজের এবং দেশের সর্বনাশ করেছে তেমনি যুদ্ধাপরাধীদের সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে দেশকে করেছে সন্ত্রাসের অভয়ারণ্য। সেই সন্ত্রাস দমন এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য খুঁজে বের করতে হবে নির্ভরযোগ্য উপযুক্ত মানুষ। বাংলাদেশের প্রতিবেশীসহ বিশ্বের সবাই অভিনন্দন জানিয়েছে বাংলাদেশের এ মহাবিজয়কে। তাঁরা দেখতে চান ইমার্জিং টাইগারকে। দেশের মানুষ সেই ইমার্জিং টাইগার সৃষ্টি করার গুরু দায়িত্ব তুলে দিয়েছে জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতে।

জননেত্রী জানেন কী করতে হবে। তাঁর রয়েছে দীর্ঘ দিনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, দেশ শাসনের অভিজ্ঞতা, দেশের মানুষকে নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা, দেশের মানুষের জন্য কাজ করার অভিজ্ঞতা। তাঁর বিগত শাসনামলে যে বিশাল অর্জন– পার্বত্য শান্তি, বয়স্কভাতা, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, অর্থনৈতিক বিকাশ এবং প্রসার এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হারিয়ে যাওয়া মুক্তিযুদ্ধের উদ্যম এবং চেতনা ফিরিয়ে আনা, এগুলো তো এখনো স্বর্ণোজ্জল। অথচ কিছু কিছু কাজ যা বিশাল অর্জনকে অল্প হলেও ম্লান করেছে। যা করেছে চাটুকারেরা। যা করেছে স্বার্থান্বেষী দলীয় নেতাকর্মীরা, যারা কেবল নিজেরটাই ভেবেছে– ভাবেনি নেত্রীর কথা, দলের কথা, দেশের কথা। ক্ষমতায় গেলে নেতানেত্রীদের সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়। নিরাপত্তার বিষয়টি এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যে দেশের আসলচিত্র অনেক সময় তাঁদের কাছে পৌঁছানো যায় না। অনেক সময়ে চাটুকাররা তা সঠিকভাবে জানতেও দেন না। যখন সর্বনাশ হয়ে যায় সব দায়-দায়িত্ব এসে পড়ে দেশের প্রধান কর্ণধারের ওপর।

তাই জননেত্রীর কাছে আমার আবেদন, সময় করে প্রতিদিনের সংবাদপত্রগুলোতে একটু চোখ বুলিয়ে নেবেন। জানবেন দেশ কেমন চলছে। মিলিয়ে নিতে পারবেন আপনাকে সঠিক তথ্য দেয়া হয়েছে কিনা। এটুকু বলতেই মনে যেন কেমন একটা সাহস এসে গেল আপনজনের কাছে আরও দু'একটি আবেদন জানাতে। দেশের ভাবি প্রধানমন্ত্রীর কাছে দেশের যে কোন মানুষই তো আবেদন করতে পারে । মনের কথা বলতে পারে। তাই না?

নির্বাচনের দিন অন্য সবার মতো আমরাও এই প্রবাসে রাত জেগে নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে টেনশন করেছি। নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলাচনা করেছি। আগামী দিনগুলো কেমন হতে পারে তা নিয়ে স্বপ্নের জাল বুনেছি। একজন ভাবি বললেন– আমি

বেগম জিয়াকে ধন্যবাদ দিতে চাই শেষতক তিনি নির্বাচন করেছেন। যদি এই নির্বাচনে তিনি এবং তাঁর জোট না আসত তবে এ মহাবিজয় কোনভাবে সার্থক হতো না। গ্রহণযোগ্যতাও প্রশ্নবোধক হতো। জননেত্রী– আপনি অবশ্য নির্বাচনোত্তর প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে বেগম জিয়াকে সে জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আরেক জন বলেছেন, জননেত্রীর জন্য চ্যালেঞ্জ হবে বেগম জিয়া এবং তাঁর দলকে সম্মানের সঙ্গে সংসদে নিয়ে আসা। তাঁরা সংখ্যায় স্বল্প কিন্তু তাঁরা বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। তাঁদেরকে সে সুযোগ দিতে হবে। বলিষ্ঠ বিরোধী দলবিহীন সংসদ যে কত দুর্ভাগ্যজনক তা আপনি জানেন এবং অতীতের হিসেবনিকেশ বাদ দিয়ে আপনাকেই অগ্রণী হতে হবে। আপনি বলেছেন, আপনি পরিবর্তিত বাংলাদেশ গড়বেন। ফলে পরিবর্তন এ ক্ষেত্রেও প্রয়োজন ব্যাপকভাবে। আপনি ইতোমধ্যেই পরিবর্তনের সূচনা করেছেন। আমরা আনন্দাশ্রু নিয়ে লক্ষ্য করেছি নির্বাচনের এই মহাবিজয়ের পরেও আপনি তাৎক্ষণিক নির্দেশ দিয়েছেন সবাইকে ধৈর্যের সঙ্গে শান্ত থাকতে। অতি আনন্দের আতিশয্যে নিপীড়িত মানুষ প্রতিশোধ পরায়ণ হতে পারত। ইতস্তত দু'একটি দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আপনি সঙ্গে সঙ্গে তা প্রতিহত করেছেন। নির্বাচনোত্তর প্রথম সংবাদ সম্মেলনে আপনার ভাষণে ছিল না কোন উত্তেজনার কথা। ছিল ধীরস্থির ভাব। ছিল নতুন বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়। ছিল বিরোধীদের প্রতি সম্মান এবং সহযোগিতার উদাত্ত আহ্বান। আমরা অবাক হয়ে প্রত্যক্ষ করলাম সে মুহূর্তে আপনি একটা বিজয় মিছিলও করতে দেননি। আমরা মুগ্ধ। আমরা গর্বিত। আমরা আশাবাদী।

আমাদের আলোচনায় সবাই একবাক্যে বলেছেন, যুদ্ধপরাধীদের বিচার এবার হতেই হবে। জননেত্রী কথা দিয়েছেন। মানুষ প্রভাবহীন স্বাধীন ভোটের মাধ্যমে সে অধিকার এবং দায়িত্ব আপনাকে দিয়েছে। আমরা চাই না তড়িঘড়ি করে কিছু হোক। চাই যথাযথ এবং ন্যায়সঙ্গত বিচার। জননেত্রী– সবার আবেদন, দুদক যেমন চলছে তেমনি চলতে হবে বরং তাকে অধিক শক্তিশালী এবং নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে দিতে হবে। তেমনিভাবে কাজ করতে দিতে হবে নির্বাচন কমিশনকে। সবাই এখানে বলেছে, এবারের নির্বাচনে যেমন জিতেছে বাংলাদেশের মানুষ, তেমনি জিতেছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা এবং নির্বাচন পরিচালনা নিয়মনীতি এমন শক্তভাবে করেছেন যা দেশের জন্য একটি মাইলফলক। এবং তাঁরা প্রমাণ করেছেন দেশের মানুষ চাইলে এবং পূর্ণ সহযোগিতা দিলে এমন দেয়াল লিখন ছাড়া, সুতলিতে ঝোলানো সাদা-কালো পোস্টার, চারদিকে মাইকের বিড়ম্বনা, হানাহানিহীন নির্বাচন করা সম্ভব। তেমনি সম্ভব যাঁরা নির্বাচন বিধি মানবেন না তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া।

আমরা চাই না, দেশ কখনও ১/১১-এর পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাক। প্রসঙ্গত একটা কথা বলতে হয় ১/১১-এর হস্তক্ষেপ যদি না হতো তথাপিও মহাজোট নির্বাচনে জিততো যেহেতু দেশের মানুষ পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিল। তবে মন্দের ভাল যেটা হয়েছে ১/১১ না হলে দেশের মানুষ হয়ত কখনোই জানতে পারত না তথাকথিত উন্নয়নের জোয়ারে দেশের অর্থ-সম্পদ কিভাবে পাচার হয়ে গেছে। কিভাবে লুটতরাজের মহোৎসব হয়েছে। কিভাবে পুকুরচুরি ক্রমশ সমুদ্রচুরি হয়েছে। কী করে কপর্দকশূন্য রাতারাতি আলাউদ্দিনের চেরাগ পেয়ে গেছে। আমরা আগামী পাঁচ বছর নিয়ে ভাবি না– আমরা ভাবি তারপরের পাঁচ বছর... এভাবে পাঁচ পাঁচ করে বছর। আগামী পাঁচ বছরের হিসেবনিকেশ নিয়েই তো আমাদের পরের পাঁচ বছর। তাই নির্বাচনের সকল প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ পূরণ হয়ত সম্ভব নাও হতে পারে কিন্তু দেশের মানুষ যেন দেখতে পারে বুঝতে পারে জননেত্রী এবং তাঁর দিনবদলের সরকারের প্রচেষ্টার কোন কমতি নেই। পূর্ব-পশ্চিমের দুই জনপ্রিয় নেতার সামনে প্রত্যাশার পাহাড়। হবে না কেন? মানুষ না পেতে পেতে এবার পাওয়ার আশায় মরিয়া হয়ে গেছে। আমরা ২০২১-এর প্রতিশ্রুত বাংলাদেশের দিকে চেয়ে আছি। আমরা আর আমাদের আশা স্বপ্ন ছিনতাই হতে দিতে চাই না। দিনবদলের সরকার হবে জবাবদিহির সরকার। ট্রান্সপারেন্ট সরকার। মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ সরকার। আধুনিক ডিজিটাল যুগের সরকার।

আমরা জানি, রাতারাতি সব বদলে দেয়া সম্ভব নয়। কিন্তু প্রক্রিয়া শুরু হোক। আন্তরিকভাবে। লোক দেখানো নয়। আমরা চাই জিল্লুর রহমানের মতো পরীক্ষিত কাণ্ডারি রাষ্ট্রপতি হোক। বিতর্কিত কেউ যেন দেশের এই সর্বোচ্চ সম্মানিত পদটি অলঙ্করণ না করে।

জননেত্রী, দূর প্রবাসে থেকে প্রবাসের মানুষ আপনার কাছে মনের কথা ব্যক্ত করতে চায়। তাঁদের হয়েই আমি কথাগুলো লিখছি। এই প্রবাসীদের চাওয়ার তেমন কিছু নেই। শুধু বুক চিতিয়ে বলার একটু অধিকার চায়– আমরা বাংলাদেশের মানুষ। আমরা কখনও হারিনি। মুক্তিযুদ্ধে হারিনি, স্বৈরাচারের কাছে হারিনি। অপশাসনের কাছে হারিনি। আমরা পরিবর্তনে বিশ্বাসী। আমরা পরিবর্তন এনে সেই একাত্তরের স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়েছি– আমরা সেই দেশের মানুষ।

সেই রাতে– সেই নির্বাচনের জয়ের রাতে আমরা হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলেছি। কখনও কাঁদতে কাঁদতে হেসে ফেলেছি। পশ্চিমের সেই দেশটার নির্বাচনের পর সে দেশের মানুষ যে যেখানে ছিল তারা সবাই যেমন করে কেঁদেছে আমরাও দেশে প্রবাসে যে যেখানে ছিলাম আমরাও কেঁদেছি– আমাদের যেন আর কাঁদতে না হয়।

জননেত্রী, এই মাহেন্দ্রক্ষণে আনন্দাশ্রু মুছে বলি, আমাদের আছে নয়ন ভরা জল আর আপনার জন্য আঁজলাভরা ফুল। সালাম হে দিনবদলের কাণ্ডারি।

লেখক: প্রবাসী শিক্ষাবিদ

বিপুল বিজয়ের বিরাট দায়িত্ব অবশ্যই নিতে হবে

ফারুক উদ্দিন আহমেদ

এবারের জাতীয় নির্বাচনে জনগণের রায় সকল পূর্বাভাসকে বিপুলভাবে ব্যর্থ প্রমাণিত করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে অবিশ্বাস্য বিজয় এনে দিয়েছে। জোটগতভাবে জয়ী আসন সংখ্যা ২৬২ আর এককভাবে আওয়ামী লীগের অর্জন ২৩০ যা সর্বকালের সকল নির্বাচনী ফলাফলকে মলিন করে দেয়া এক বিপুল বিজয়। অনেকেই ভাবনায় পড়েছিলেন জাতীয় পার্টির সহায়তায় আওয়ামী লীগকে সরকার গঠন করতে হয় কিনা আর এরশাদ যদি অতীতের মতো নাটকীয় অবস্থান নেন তখন কী হবে। বাংলাদেশের আপামর জনগণ এ সংশয়ের সঠিক জবাব দিয়েছে। তারা বলে দিয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দলটিকে সরকার গঠনে কারও মুখাপেক্ষী হতে হবে না। তাই এখন জাতির বৃহত্তর স্বার্থে আওয়ামী লীগ তার নিজস্ব সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়েই সংসদে সব প্রয়োজনীয় আইন ও নীতি প্রণয়ন করতে পারবে।

বিপুল বিজয়ের পর জননেত্রী শেখ হাসিনা তার প্রথম সংবাদ সম্মেলনেই নিজের মেনিফেস্টোর ভিত্তিতে সবাইকে নিয়ে জনস্বার্থে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করার কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন যা খুবই প্রশংসনীয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সংশ্লিষ্ট সকলকে তিনি সংযম প্রদর্শন করতে এবং অনর্থক বিজয় আনন্দ করে বিজিতদের উত্যক্ত না করতে বলেছেন। তার মতো মহান বিজয়ীর নিকট এটাই ছিল প্রত্যাশিত।

জননেত্রী শেখ হাসিনার বিপুল বিজয়ের পিছনে রয়েছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে জনগণের প্রত্যাশা, এই সেদিনও এক রাজাকার টিভির পর্দায় বলেছে, বাংলাদেশে কোন যুদ্ধাপরাধী নেই– এখানে কোন মুক্তিযুদ্ধ হয়নি। যে দু'জনকে বেগম জিয়া মন্ত্রী বানিয়ে বাংলাদেশের পতাকাখচিত গাড়ি চড়তে দিয়েছিলেন সে তাদের অন্যতম। ভাগ্যিস সে, তার নেতা ও সমর্থকরা প্রায় সবাই এখন জনরায়ে নর্দমায় নিক্ষিপ্ত। তবুও তাদের লজ্জা হয় না।
জননেত্রী শেখ হাসিনা পরিষ্কার বলেছেন, জনগণের সমস্ত কষ্টের কারণ দ্রব্যমূল্যই তার সবচেয়ে বড় শত্রু। যে কোন দেশপ্রেমিক নেতানেত্রীর কাছে এটাই প্রত্যাশিত। দ্রব্যমূল্য কমিয়ে জনগণের ক্রয়ক্ষমতার ভিতরে আনা খুব সহজ ব্যাপার না। তবে জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে জেতা সরকারের পক্ষে তাও অনেকাংশেই সম্ভব। কারণ যে ব্যবসায়ীদের অনির্বাচিত সরকার কিছুতেই বাগে আনতে পারছিল না, নির্বাচিত সরকারের পক্ষে তা সহজেই সম্ভব। তবুও এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অনেক নীতিগত ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিতে হবে। আশা করা যায়, নতুন সরকার ক্ষমতায় গিয়ে প্রথমেই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় রাজস্ব ও মুদ্রানীতিভিত্তিক পদক্ষেপের পাশাপাশি অন্যান্য পদক্ষেপ নেবে। দশ টাকার চাল চল্লিশ টাকায় নিয়ে যাওয়ার জন্য যে দুর্নীতিবাজ ও সিন্ডিকেট দায়ী তা ভেঙ্গে দিলে এমনিতেই বাজারে অনুকূল প্রভাব অনুভূত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।
নবনির্বাচিত সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপই সুচিন্তিত ও জনস্বার্থে গৃহীত হবে– এটাই আমাদের সবার কাম্য। সব সময়ই চাটুকাররা ক্ষমতাসীনদের ঘিরে ধরে ভুল ও ভ্রান্ত পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করে। জননেত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর সহকর্মীরা এ ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন বলে আশা করা যায়। প্রশাসনে সাবেক জোট সরকার অনেক নৈরাজ্যের সৃষ্টি করেছিল। চাটুকারদের পরামর্শমতো অনেক যোগ্য ও সৎ কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসর দিয়েছিল। এমনকি এক বছরে দু'তিনটি পদোন্নতিও দেয়া হয়েছিল অনেক ক্ষেত্রে। আশা করা যায়, বর্তমান সরকার নিয়মনীতি, আইন ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত নেবে, কোন চাপে বা অন্যায় প্রভাবে নয়। এখনও অনেকে কারাগারে আছেন– যেমন জনকণ্ঠ সম্পাদক আতিকউল্লাহ খান মাসুদ, যিনি একজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধাও; যা মাননীয় নেত্রী নিজেও জানেন। তাই ন্যায়বিচারের স্বার্থে এসব ব্যক্তিকে অবিলম্বে মুক্তি দেয়া এখন সময়ের দাবি। আবারও আমরা দাবি করছি, এ দেশে ন্যায়বিচার, আইনের শাসন ও শৃঙ্খলা পুনর্প্রতিষ্ঠিত হোক। ইতিহাস বিকৃতির খলনায়কদের বিচারের আওতায় আনা হোক, যারা এতদিন জাতিকে বিভ্রান্ত করেছে। আবার এ দেশে শান্তি ও স্বস্তির সুবাতাস বইতে শুরু করুক– এটাই আপামর জনগণের একান্ত প্রত্যাশা। বিপুল বিজয়ের মাধ্যমে সরকারের ওপর যে গুরুদায়িত্ব বর্তেছে, তার প্রেক্ষিতে নতুন সরকারকে জনগণের আশা পূরণ করতেই হবে। এর কোন বিকল্প নেই।

লেখক : অর্থনীতিবিদ